প্রতিদিন

ছুটি

রবিবার ১২ আগস্ট ২০১৮

২ আমার নাটক যদি অবচেতনে কাউকে অনুপ্রাণিত করে, তার চেয়ে বেশি আর কীই বা চাইতে পারি! বলতেন বাদল সরকার
সৌমিত্র বসু

৩ দেবেন্দ্রনাথের উপর স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট দ্বারকানাথ ঠাকুর। ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করছে, তাই বলে বাড়ির পুজোয় থাকবে না!
কাবেরী রায়চৌধুরী

৪ নতুন কলাম। 'যখন যেমন'। পাহাড়ি ঝরনার মতো অনর্গল। বিষয়ে বহুমুখী।
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

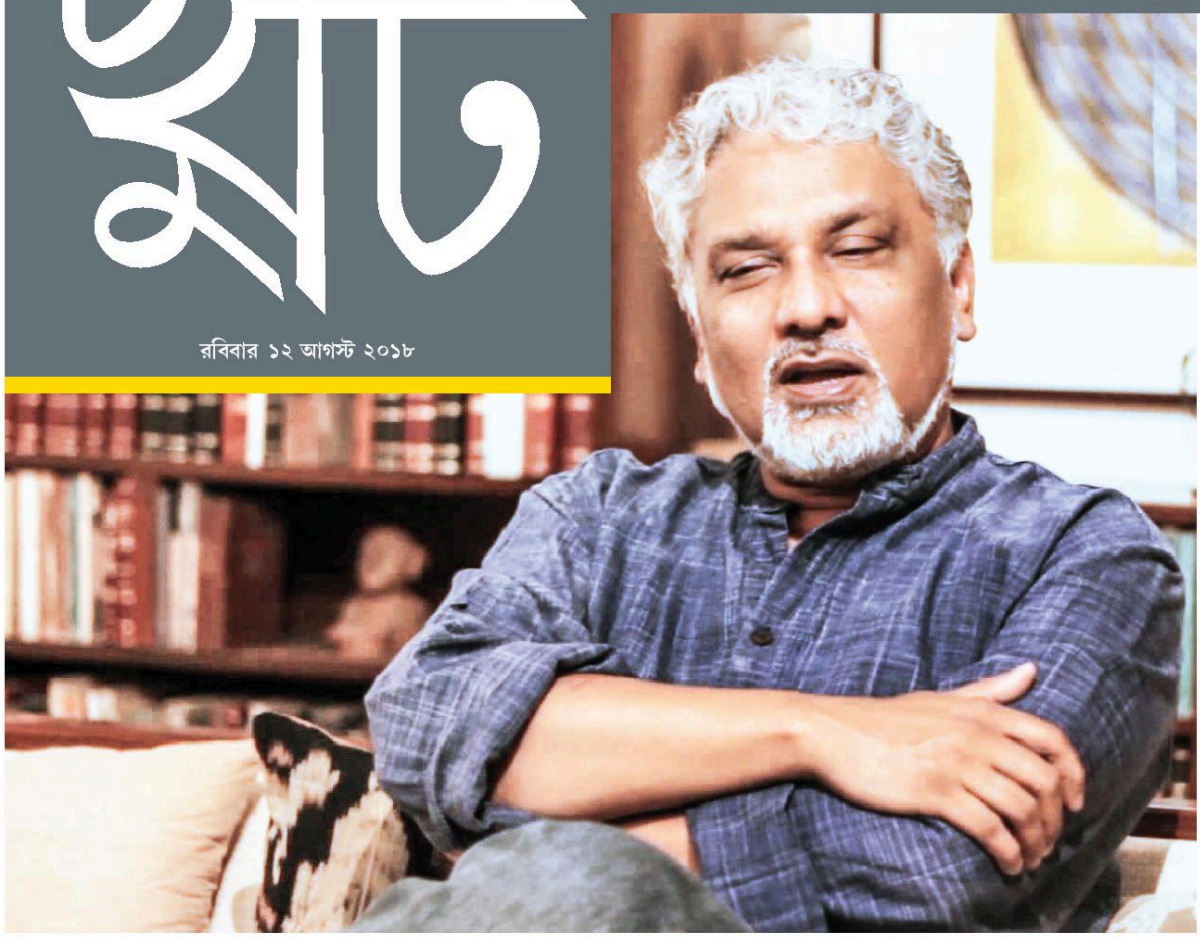

বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শত্রু কমিউনিস্ট পার্টি

'দ্বিভাষিকতা' মানে কী? যে দু'টো ভাষা জানে, বলতে ও লিখতে পারে? না কি যে নিজের মধ্যে দু'টো ভাষা-সংস্কৃতির স্রোত ধরে রেখেছে? যেসব বাঙালি লেখক ইংরেজিতে লেখেন, তাঁরা বাংলা পড়তে পারেন না। আর, বাংলাভাষী পাঠক বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন। এ কি সভ্যতাবিরোধী নয়? জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে গোর্কি সদনে **কুণাল বসু**-র সঙ্গে কথা বলেছিলেন **চিন্ময় গুহ**। সেই কথোপকথন 'ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

চিন্ময় গুহ
chinmoy.guha@gmail.com

চিন্ময় গুহ কুণাল বসুর পাঁচটি ইংরেজি উপন্যাস ও তিনটি বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইংরেজিতে লেখা গল্পের বই 'দ্য জ্যাপানিজ ওয়াইফ'। আপনারা সকলেই জানেন ভারতে ইংরেজি উপন্যাসের যে-ধারা তৈরি হয়েছে গত সাতের দশক থেকে, তার অন্যতম মিনার কুণাল বসু। ওঁর নতুন বইটির নাম 'তেজস্বিনী ও শবনম'। এর আগে আমাদের অবাক করে দিয়ে দু'টি বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। 'অবাক' বলছি কারণ যাঁরা 'Indian writer in English' বলে পরিচিত, ধরা যাক অমিতাভ ঘোষ, অমিত চৌধুরী, ঝুম্পা লাহিড়ী প্রমুখ, তাঁরা কেউই বাংলায় লেখার কথা কল্পনাও করেননি। এই প্রসঙ্গে আমরা 'বিশ্বনাগরিকতা'-র কথা তুলব। একজন মানুষ তখনই বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠেন যখন তার একটা দীর্ঘ ও শক্ত শিকড় থাকে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'তেজস্বিনী ও শবনম', অদ্ভুত সুন্দর নাম। এর আশ্চর্য প্রচ্ছদের পরিকল্পনা যে-গুণী শিল্পীর, তাঁর নাম পিনাকী দে। কুণালের জন্ম পাঁচের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, কলকাতায়। এখন থাকেন কলকাতা এবং অক্সফোর্ডে। অনেক উপাদানের সংমিশ্রণ দেখতে পাব আমরা তাঁর মধ্যে, যার থেকে এই বিস্ফোরণ হয়েছে। গতানুগতিক পথে যাননি। প্রথম থেকেই অপ্রত্যাশিত তাঁর আবির্ভাব। যাদবপুরের স্নাতক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা, পড়ান কানাডার বিশ্ববিখ্যাত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে উনি এখনও আছেন। প্রথম ইংরেজি উপন্যাস 'দ্য ওপিয়াম ক্লার্ক'। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে আধারিত এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এরপরে দ্বিতীয় উপন্যাস 'দ্য মিনিয়েচারিস্ট' অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ, ইউরোপের পাঠকের মতে ওটাই ওঁর প্রতিনিধিত্বমূলক লেখা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তারপরে 'দ্য রেসিস্ট', "ইয়লো এম্পেরর'স কিওর" এবং 'কলকাত্তা' শেষ উপন্যাস যেটা ২০১৬য় প্রকাশিত হয়। ছাড়াও গল্প সংগ্রহ 'দ্য জ্যাপানিজ ওয়াইফ', যা থেকে একটি চলচ্চিত্র হয়েছে আমরা সকলেই জানি। প্রতিটি উপন্যাসে কুণাল একটি সমস্যা ব্যবহার করে নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেন। যেমন— 'ওপিয়াম ট্রেড', উনিশ শতকে আফিমের ব্যাবসা। 'কলকাত্তা' একটি পুরুষ দেহ-ব্যবসায়ীর গল্প। বানানো কলকাতা বা সাংস্কৃতিক রাজধানী বা অন্ধের স্বর্গ নয়, প্রকৃত অর্থেই রাস্তার শহরের উপাখ্যান, যে-কলকাতার মাঝে আছে আরেকটা কলকাতা। যখন লেখাটি লেখা হচ্ছিল আমি অক্সফোর্ডে অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'বইটা সেন্সরড হতে পারে কি?' উনি বললেন, 'না, কুণাল sensationalist লেখা লেখে না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেলে মানুষকে বোঝার চেষ্টা করে।'

'তেজস্বিনী ও শবনম' ও অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের মধ্যে তফাত কী? প্রধান তফাত, ইংরেজির কোনও ঔপন্যাসিক বাংলায় লেখেননি। তার জন্য সাহস লাগে। প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর উনি আরেকটি অগ্নিপরীক্ষায় গিয়েছেন। বিশ্বের চারপাশটা এখন কেমন এবং তার মধ্যে এই বইটার স্থানাঙ্ক কী, যদি বোঝার চেষ্টা করি, শঙ্খ ঘোষের কবিতা মনে পড়ে যাবে: জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে,/... সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে/ কে কাকে বোঝাবে কিছু আর/ সমুদ্রে গিয়েছে তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়... ধড় খুঁজে আর্তনাদ করে... কে কাকে বোঝাবে কিছু আর/ অর্থহীন শব্দগুলো আর্তনাদ করে, আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো/ দেশ আমাদের আজও কোনো/ দেশ আমাদের আজও কোনো/ দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও।

বিশ্বজুড়ে এরকম একটা অবস্থাতে যখন চারপাশে শব্দের শরীর থেকে রক্ত পড়ছে, আমাদের স্নায়ু বেয়ে নেমে যাচ্ছে মাটিতে, সেই সময় 'তেজস্বিনী ও শবনম'। কে তেজস্বিনী? সে নিউ জার্সির একটি বাঙালি মেয়ে— মাতৃহীন। যুদ্ধের সাংবাদিক। দু'পাশে সৈনিকদের ক্যাম্প, মাঝখানে যুদ্ধ সাংবাদিকরা। কখনও কখনও জল খেতে হয় এক বালতি থেকে, একই ট্যাঙ্কে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাতায়াত, টি. এস. এলিয়টের সেই কবিতার লাইন 'Burning, Burning, Burning, Burning...' তারই মাঝখানে। আর শবনম? সে সুন্দরবন থেকে পাচার হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে।

আমরা সবাই জানি মধুসূদন 'The Captive Lady' লিখেছিলেন ইংরেজিতে, তারপর বাংলায় ফিরে এলেন। "Rajmohan's Wife" লিখেছিলেন বঙ্কিম, তারপর বাংলায় এলেন। ভাগ্যিস এলেন! এরকম দ্বিভাষিকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে যদি ধরেন, ওঁর ইংরেজি অনুবাদগুলো স্বতন্ত্র লেখা। ওঁর চেয়ে অত বড় বিশ্বনাগরিক আর কে আছেন? কিন্তু তারপর? এই শতাব্দীতে আর আমরা দেখছি না। আমি মনে করি কুণালের ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম অর্জন করার পর বাংলায় ফিরে আসা— একবার দু'বার নয়, তিনবার, এটা বেশ একটা বিরল ঘটনা। এই দ্বিভাষিকতা সম্পর্কে বলুন।

কুণাল বসু দেখুন চিন্ময়, আপনি-আমি যে-প্রজন্মের বাঙালি, সেই প্রজন্মে 'ইংরেজি বনাম বাংলা' ব্যাপারটা ছিল না। মানে দু'টো ভাষার মধ্যে একটাকেই বেছে নিতে হবে। আমরা যারা মিশনারি স্কুলে পড়িনি, অথচ পারিবারিক কারণেই বলুন বা অসামান্য কিছু শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম বলেই বলুন, কখনওই ভাবিনি দু'টো ভাষার মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ইংরেজিতে লিখলে আমাকে বাংলাকে ত্যাগ করতে হবে বা উল্টোটা। 'ইংরেজ জাত' আর 'ইংরেজি ভাষা' কিন্তু এক নয়। ইংরেজ শুনলেই মনে হত— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, বা অনন্ত সিংহ, যাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সতীশ পাকড়াশির 'অগ্নিযুগের কথা' ছোটবেলায় কতবার যে পড়েছি বলতে পারব না। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ভাষার প্রতি কোনও বৈরিতা ছিল না। কী করে থাকবে? ডিকেন্স তো শত্রু হতে পারেন না। অথবা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের যে-লেখকদের পড়েছি— তলস্তয়, এমিল জোলা, ভিক্টর য়্যুগো, টোমাস মান তো শত্রু হতে পারেন না। কাজেই এই দ্বিভাষিকতা আমাদের বাংলা সভ্যতারই একটা বিশেষ দিক বলে আমি বিশ্বাস করি।

চিন্ময় রনেসাঁসে যখন বাংলার বিকাশ হচ্ছে, তখন তরু দত্ত, মাইকেল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম— এঁরা সকলেই দ্বিভাষিকতার এক একটি নিদর্শন তুলে ধরছেন।

কুণাল আমি ১৩ বছর ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছি, ফ্রেঞ্চ কানাডায়। ওরা বলত, 'আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দ্বিভাষী জাত'। ইংরেজি এবং ফরাসি, দু'টোই আমাদের নখদর্পণে। আমি কলার তুলে লড়াই করে বলতাম, "না, তোমরা নও, আমরা বাঙালিরা প্রকৃত অর্থে দ্বিভাষী। কারণ ওই শব্দের মানে এই নয় আমি দু'টি ভাষায় ব্যাকরণসম্মত কথা বলি বা লিখি... দ্বিভাষিকতা মানে দু'টো স্রোত আমার মধ্যে রয়েছে, যার একটা থেকে অন্যটায় ঝাঁপ দিতে কারও অনুমতি নিতে হয় না।" এই ব্যাপারটা কেবলমাত্র বাঙালিদের ক্ষেত্রেই খাটে। তবে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল, এই দ্বিভাষিকতা উনবিংশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' থেকে শুরু করে বিংশ শতকের ছয় এবং সাতের দশক অবধি চলে এসেছে। তারপর আমরা এক অদ্ভুত মনোলিঙ্গুয়াল কালচারের কবলে পড়েছি। যে-বাঙালি লেখকরা ইংরেজিতে লেখেন তাঁরা বাংলা পড়তেও পারেন না। আবার যাঁরা বাংলা সাহিত্যে আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে ইংরেজি বা বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল দেখি না। এই বিভাজন কিন্তু আমাদের সভ্যতাবিরোধী। আমরা আগে এরকম ছিলাম না। আপনি রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দিলেন। আমি একটা কথাই বলব, 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠি লিখেছিলেন, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনে যেটা রাখা আছে, সেটা যদি সাহিত্য না হয়, তাহলে সাহিত্য কী?

চিন্ময় চেমসফোর্ডকে লিখেছিলেন, ১৯১৯। আপনি যেমন বললেন ডিকেন্সও আমাদের, শেক্সপিয়রও আমাদের।

কুণাল ছোটবেলায় আমি একদমই ইংরেজি পড়তে চাইতাম না। বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজি বই পড়িনি। মা-বাবা চেষ্টা করতেন এটা-সেটা পড়াতে। "গালিভার'স ট্রাভেলস", 'ট্রেজার আইল্যান্ড' ইত্যাদি। খালি বাংলাতেই পড়তাম। হেমেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়।

চিন্ময় আমারও! 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর বাংলা অনুবাদে ইংরেজি সাহিত্য পড়তাম। সুধীন্দ্রনাথ রাহা ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এসব পড়েই বিমলানন্দ পেয়েছি।

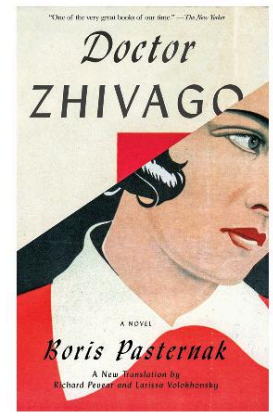

আটের দশক থেকেই বামপন্থার সত্যিকারের পথদ্রষ্টারা সরে যাচ্ছিলেন, জাঁকিয়ে বসছিলেন কর্মকর্তারা।

কুণাল একদম, একদম। অনেক দিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, ডিকেন্স আসলে বাঙালি। ওঁকে তো বাংলাতেই প্রথম পড়েছি।

চিন্ময় তরু দত্ত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস লিখেছেন এশিয়াতে। ফরাসি উপন্যাস লিখেছেন 'Le Journal de Mademoiselle d'Arvers'. তাতে একটি কমাও পরিবর্তন করতে পারেননি প্রকাশক। মারাঠি থেকে অনুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বালগঙ্গাধর তিলক। আমাদের মধ্যে দ্বিভাষিকতা ছিল। ভারত পৃথিবীর সব থেকে বড় ভাষা গবেষণাগার। The biggest language laboratory of the world. ১৬৫২টি ভাষা আমাদের। ১৬৫২টি ডায়ালেক্ট নয় কিন্তু। এর মধ্যে ৩৩টি ভাষায় এক লক্ষের বেশি মানুষ কথা বলেন। এই বিশ্বের চলমান ল্যাবরেটরিতে আমরা দ্বিভাষিকও হতে পারব না? ৩৪ ভাষাবিদ হরিনাথ দে-কে তো পাওয়া এখন মুশকিল!

কুণাল ত্রৈভাষিকতা তো আমার পাশেই বসে আছেন। আপনি! ইংরেজি, বাংলা ও ফরাসি।

চিন্ময় হ্যাঁ, তবে আমরা একটা কানাগলির দিকে যাচ্ছি। এটা একটা বড় ঘটনা। খবরের কাগজের জাস্ট আনাদার নিউজ তা কিন্তু নয়। ভীষণ বিস্ফোরক একটা এনকাউন্টারের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। ধরুন অন্য লেখকদের কথা। মিলন কুন্দেরা, নবকভ। ফাদার দ্যতিয়েনের মতো ফরাসি এবং বাংলা একসঙ্গে। স্যামুয়েল বেকেট ফরাসিতে বহুগুণ বেশি লিখেছেন ইংরেজির চেয়ে। কাজেই দ্বিভাষিকতা, আন্তর্জাতিক স্তরে আছে। কিন্তু আমাদের এখানে নেই। সলমন রুশদি কোথাও একটা লিখেছিলেন, ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য অত্যন্ত নিম্নমানের। ইংরেজি সাহিত্য এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ— এরকম একটা ধারণা সারা দুনিয়ার কাছে পেশ করেছিলেন।

কুণাল সলমনকে এই নিয়ে বহু জায়গায় গালমন্দ করেছি।

চিন্ময় এসব কারণেই 'তেজস্বিনী ও শবনম' একটি প্রতীকী প্রকাশনা। শুধু একটা ঘটনা নয়, তার চেয়ে বেশি এর মূল্য। আপনি Cosmopolitanism with roots চেয়েছেন, ইংরেজি ও বাংলার মেলবন্ধনের জন্য যা অত্যন্ত জরুরি, তাই না?

কুণাল একটা কথা আমার খুবই মনে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের মন। তাঁর ভাবনা, তাঁর চেতনা। দর্শন, মনস্তত্ত্ব। সুন্দর ঝরঝরে বাংলা লিখতে পারেন অনেকেই। কিন্তু তা বলেই কি সেটা 'সাহিত্য' পদবাচ্য হবে? পদবাচ্য হবেই না। চেতনার জায়গাটাই যিনি লেখক আর যিনি নিতান্তই সু-লেখনীর অধিকারী তাঁর মধ্যে তফাত গড়ে দেয়। এক্ষেত্রে আমার পরম সৌভাগ্য, আমি যে-সময় এবং যে-পরিবারে বড় হয়েছিলাম, সেখানে আমার চারপাশে বহু বিশ্বনাগরিক ঘোরাফেরা করছিলেন। আমাদের বাড়িতে আসতেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিককুমার ঘটক, বিষ্ণু দে, রাধারমণ মিত্র, উৎপল দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বারীন সাহা আরও অনেকে। আমার মনে পড়ে এক একটা সন্ধ্যার কথা... বেটোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি বাজছে, তুমুল তর্ক হচ্ছে কী নিয়ে? ফ্রান্সের ন্যুভেল ভাগ বনাম ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম।

চিন্ময় আপনার বাবা সুনীলকুমার বসু। ওই আমলের অত্যন্ত নিবিষ্ট কমিউনিস্ট। মা ছবি বসু, লেখিকা। পরিবারটাই একটা সাংস্কৃতিক হট হাউস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ' প্রকাশ করছেন আপনার বাবা। ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। কাজেই পরিবেশটা একেবারেই তৈরি হয়েছিল।

কুণাল আবার সবকিছুই যে খুবই গুরুগম্ভীর আলোচনা তা নয়। চলচ্চিত্রকার বারীনকাকা তখন ইতালি থেকে সবে ফিরেছেন। ফিরেই সরাসরি আমাদের রান্নাঘরে ঢুকলেন। বললেন— শোনো, আজ তোমাদের স্পাগেটি রান্না করতে শেখাব। তবে দোকান থেকে কিনে আনা টম্যাটো সস দিয়ে নয়। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা ধরে কেজি কেজি টমেটো কাটা হল, জলে ফোটানো হল। শেষমেশ কী দাঁড়াবে কেউ জানে না! রাতে আমরা সেই অথেন্টিক টম্যাটো সস দিয়ে স্পাগেটি খেতে শিখলাম। আমার মা অনুবাদ করছিলেন, থিও এবং ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের পত্রাবলি। ফরাসি থেকে বাংলায়। আমার মা ও বাবার আলাপ হয়েছিল চারের দশকে ফরাসি শিখতে গিয়ে আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এ। মা আমার বাবাকে গিয়ে বললেন, 'আপনিই কি সেই প্রকাশক যিনি আমার বইটা প্রকাশ করছেন বলে শুনেছি?' বাবা বললেন, 'কোন বই? আপনাকে ঠিক চিনলাম না তো।' তখনই ওঁদের মধ্যে পরিচয় হয়। বইটির নাম 'বাংলার নারী আন্দোলন'। আমার বাবা, সত্যজিৎ রায় এবং কমলকুমার মজুমদার, তিনজন মিলে শুরু করলেন 'Western Classical Music Society of Bengal'. তখন রাশিয়া থেকে লং প্লেয়িং রেকর্ড আসত। প্রচণ্ড চিন্তা, শস্টাকভিচ-কে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু প্রকোফিয়েভ-কে পাওয়া যাচ্ছে

এরপর ২-এর পাতায়

সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ যখন মনমোহন চলে যাচ্ছেন বাড়ি থেকে, বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন জিনিসটা কখনও হবে না কথা দিয়েছ?' শিশুটি বলে, 'কূপমণ্ডূক।' মনমোহন উত্তর দেন, 'কূপমণ্ডূক, মনে থাকবে?'

রোদ-বাতাসের পথ

অনিতা অগ্নিহোত্রী
agnihotrianita@yahoo.co.in

তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল

কেওনঝর জেলার গোনাসিকা অঞ্চলে বৈতরণি নদীর উৎপত্তি। সেখানে থাকে আদিম উপজাতি ‘জুয়াংগ’-রা। সাক্ষরতার হার এত কম যে, কয়েকটি গ্রামে কোনও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়াই গেল না। একটি গ্রামে ছোট এক স্কুলের ছাত্র, দায়িত্ব নিয়েছিল বড়দের পড়ানোর। তার বাবা-মা দু’জনেই তার ছাত্র। এছাড়া আরও সব বয়স্ক মানুষ। এক-একজনের এক-এক সমস্যা। ক্লাসে মাকে আঁকা শেখায় ছেলে আর রাতে মায়ের গায়ের উপর পা তুলে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুময়। তাকে নিয়ে লিখেছিলাম মজার এক গল্প: ‘রতন মাস্টারের পাঠশালা’।

দু’বিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিল পেয়ে উপেনের হৃদয়ের ফাঁক ভরেনি। সে ফিরে চলে এসেছিল নিজের আমগাছটির কাছে।

প্রশাসনে এভাবে ফেরা যায় না। একবার চার্জ হ্যান্ডওভার রিপোর্টে সই করা হয়ে গেল মানে তুমি ‘নেই’ হয়ে গেলে। সেই পুরনো দায়িত্ব বিষয়ে, ফেলে যাওয়া অফিসের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য ততটাই গ্রহণযোগ্য, যতটা সাংসারিক ব্যাপারে পরলোকগত আত্মার। বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে দেখলাম বাস্তববোধসম্পন্ন সরকার আমার মতো একটি অ(তি)-প্রশাসনিক ব্যক্তিকে সারা রাজ্যের গণশিক্ষার ভার দিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই, সুন্দরগড় নেই বলে মনখারাপ করো না। ‘বিকল্প’ হিসাবে তোমাকে দেওয়া হল সারা রাজ্যের ভার। এখন কোন জেলায় কী করতে চাও করো। সুন্দরগড়ের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য মন হু হু করে উঠল। কিন্তু সেখানে ফেরার পথ বন্ধ। কাজেই কাজে নেমে পড়লাম।

আজকাল যেমন হচ্ছে ‘স্বচ্ছ ভারত’ মিশনের আওতায় এবং তার আগে ‘নির্মল গ্রাম’ ঘোষণার বেলায়, তখনও সারা দেশে জেলাগুলিকে পূর্ণ সাক্ষর ঘোষণা করার জন্য হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা অদম্য অথচ অর্থহীন প্রবণতা। যেসব রাজনীতিক অভিযান চলাকালীন কোনও আগ্রহ দেখাননি, তাঁরাই পূর্ণ সাক্ষর ঘোষণার সময়ে বুক ফুলিয়ে ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলেন। ‘জাতীয় সাক্ষরতা মিশন’ এ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছিল। পড়ালেখার পর্ব শেষ হলে নবসাক্ষরদের পরীক্ষা হবে। তাতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা, বহিরাগত পরীক্ষক— সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহলে কী হবে, প্রথম হওয়ার মানসিকতাকে তো ইরেজার দিয়ে ঘষে তোলা যায় না। কাজেই সেইসব পরীক্ষার ফলাফলেও কারচুপির প্রবণতা বাড়তে থাকল। সাক্ষরতার আসল উদ্দেশ্য যে প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন এবং তাদের কোনও মতে পরীক্ষা পাস করানো নয়, এ-কথা অত্যুৎসাহী জেলাশাসক, এমএলএ-দের বোঝানো মুশকিল।

এই পর্বে পুরো রাজ্যে ঘোরার বিরাট সুযোগ পেয়েছিলাম। গ্রামগঞ্জ, পঞ্চায়েত, ব্লক— সর্বত্র। প্রকৃতির বিপুলতা এবং সেই প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন সংগ্রাম কাছ থেকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাকে অভিভূত করেছিল। টাকাপয়সা, স্টাফ অফিসারের বলে আমাকে বলীয়ান করা রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য ছিল না। স্কুল ও কলেজ শিক্ষার গুরুত্ব আছে খাতা-কলমে, কিন্তু গণশিক্ষা মানেই হচ্ছে আগের জমানার না-করা কাজের বোঝা, কাজেই তার কোনও প্রত্যক্ষ গুরুত্ব নেই।

আমি চেষ্টা করতাম এ-কাজে লেগে থাকা স্বেচ্ছাসেবী ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সুবিধা বোঝার। দেখলাম, কী কঠিন মানুষের জীবন। সারাদিন নিজের বা অন্যের খেতে কিংবা কলকারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি, সন্ধেবেলা গ্রামের কোনও পঞ্চায়েত ঘর বা মন্দিরের বারান্দায় বসে অচেনা অক্ষর শেখা, আঁক কষা কিংবা হাতের লেখা করা। তবু তাদের কী বিপুল আগ্রহ, যেন অচেনা দুনিয়ার চাবিকাঠিটি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ার অপেক্ষা। এদের অধিকাংশই হতদরিদ্র, দু’বেলা ভাল করে খাওয়া জোটে না। এরাই নিজের পয়সা গুনে গুনে খরচ করে রাতে পড়ার কেরোসিন তেলের খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে।

এরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, সাক্ষরতা অর্জন করলে এদের জীবন বদলাবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে এরা না পেত কোনও পড়াশোনা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বা বইখাতা, কিংবা শিক্ষিতজনের সাহচর্য। ফলে অনেকেরই সযত্নে অর্জিত সাক্ষরতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত অক্ষরজ্ঞানহীনতায়। তাছাড়া, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার কঠিন প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। সুন্দরগড়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি জনসংগঠন ও সচেতনতার যে-কাজ আমরা শুরু করেছিলাম, বলা যায় তারই অভিঘাতে আমার নিষ্ক্রমণ। সব জেলায় এভাবেই কাজ হবে তার কোনও মানে নেই। তবু চেষ্টা করতাম, যাতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে লড়াইও সাক্ষরতা অভিযানের পাশাপাশি চলে। পড়াশোনা শেখার ফলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। সে-ও এক সামাজিক পরিবর্তন।

কোরাপুটে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। মঞ্চে আমার একধারে জেলাশাসক, অন্য দিকে পুলিশের এসপি। ‘পরজা’ আদিবাসী মেয়েরা খুবই স্বাধীনচেতা ও সাহসী হয়। মঞ্চে আমার সঙ্গে হাত মেলাবে বলে উঠে এসেছে দুই নবসাক্ষর মহিলা। নাকে সোনার নথ। চুলে বন্য ফুল। জমকালো শাড়ি পরা। আজকের অনুষ্ঠান মানে তাদের মহোৎসব। তাদের একজন, এসপিকে বলছে— তুমি একটু ওপাশে সরো তো বাবু, ম্যাডামের পাশে আমরা বসব। এসপি হেসে উঠে গেলেন। শুধু এতেই কিছু হয় না অবশ্য, কিন্তু এভাবেই তো আরম্ভ হতে পারে।

নবসাক্ষরদের খোঁজে, তাদের পড়াশোনা লেখার গুণমান দেখতে গিয়ে কত বিচিত্র জায়গায় গিয়ে পৌঁছতাম। দেশের বৃহত্তম জেলা কোরাপুট তখনও ভাগ হয়নি। দক্ষিণতম প্রান্তে মালকানগিরি। রাজধানী থেকে মালকানগিরি মহকুমা শহরে পৌঁছতেই লাগত ১৬ ঘণ্টা। কালাহান্ডি, কোরাপুট, মালকানগিরি ও বস্তারের অনেকটা জুড়ে প্রাচীন দণ্ডকারণ্য ভূমি। রামায়ণে কথিত সেই মহাকান্তার অনেকটাই বিলীন, কিন্তু আদিম অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার চিহ্ন সর্বত্র। ‘বালিমেলা পাওয়ার প্রোজেক্ট’-এর জলাধারে ডুবে গিয়েছে চিত্রকোন্ডা অঞ্চলের বিস্তৃত অংশ। কিন্তু জলের মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে আছে পাহাড়ের কালো মাথা। বহু গ্রামের মানুষ নিজেদের বসত ছেড়ে উঠে যেতে চায়নি। এই তাদের প্রতিবাদ। ফলে জলের মধ্য দিয়ে নৌকা অথবা লঞ্চে করে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাওয়া। চিকিৎসার সুবিধা নেই, চাল-ডাল-তেল-নুন-দেশলাই সব আসে মূল ভূখণ্ড থেকে। এ মাসের গত সপ্তাহে পাওয়ার প্রজেক্টের ৪৬ বছর পর তৈরি হল গুরুপ্রিয়া নদীর উপর ব্রিজ। দেরি হয়ে গেল কি?

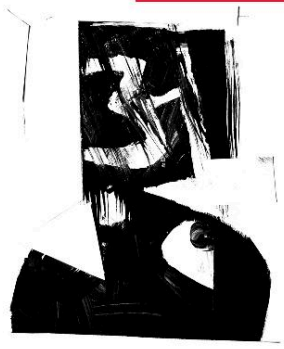

বাংলায় তখন লেখক-সাহিত্যিকদের ডাক পাঠানো হয়েছে নবসাক্ষরদের জন্য বই লিখতে। মহাশ্বেতা দেবী থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবাই মেতে উঠেছেন। আমার লেখা জুয়াংগ ছেলের গল্পও সেই স্রোতে মিশে গেল। কলেজ স্ট্রিটের এক অফবিট প্রকাশকের ছাপা এই বই বিক্রি হয়েছিল হাজার দশেকেরও বেশি। আমার সর্বাধিক বিক্রীত বই। গণশিক্ষা আন্দোলন এভাবেই মিলিয়েছিল দেশান্তর-গ্রামান্তরকে।

আজ থেকে ২৫ বছর আগে, ওই দ্বীপের মতো গ্রামগুলিতে নৌকা চড়ে গেরুয়া উত্তাল জলের মধ্যে ঘুরে দেখেছিলাম, অভিমানী মানুষরা লেখাপড়া শিখছে। কী পরিবর্তন, কেমন মুক্তি চেয়েছিল তারা কী জানি!

কেওনঝর জেলার গোনাসিকা অঞ্চলে বৈতরণি নদীর উৎপত্তি। সেখানে থাকে আদিম উপজাতি ‘জুয়াংগ’-রা। সাক্ষরতার হার এত কম যে কয়েকটি গ্রামে কোনও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়াই গেল না, বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষর কেউ নেই। একটি গ্রামে ছোট এক স্কুলের ছাত্র, দায়িত্ব নিয়েছিল বড়দের পড়ানোর। তার বাবা-মা দু’জনেই তার ছাত্র। এছাড়া, আরও সব বয়স্ক মানুষ। এক-একজনের এক-এক সমস্যা। ক্লাসে মাকে আঁকা শেখায় ছেলে আর রাতে মায়ের গায়ের উপর পা তুলে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুময়। তাকে নিয়ে লিখেছিলাম মজার এক গল্প: ‘রতন মাস্টারের পাঠশালা’। বাংলায় তখন লেখক-সাহিত্যিকদের ডাক পাঠানো হয়েছে নবসাক্ষরদের জন্য বই লিখতে। মহাশ্বেতা দেবী থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবাই মেতে উঠেছেন। আমার লেখা জুয়াংগ ছেলের গল্পও সেই স্রোতে মিশে গেল। কলেজ স্ট্রিটের এক অফবিট প্রকাশকের ছাপা এই বই বিক্রি হয়েছিল হাজার দশেকেরও বেশি। আমার সর্বাধিক বিক্রীত বই। গণশিক্ষা আন্দোলন এভাবেই মিলিয়েছিল দেশান্তর-গ্রামান্তরকে।

যেখানেই যেতাম, নতুন পড়ুয়াদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতাম— নতুন লিখতে শিখে প্রথম চিঠি কাকে লিখবে? ‘তোমাকে, তোমাকে’। তখন তাদের কাছে রেখে আসতাম আমার নাম-ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড।

নবসাক্ষরদের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা চিঠিতে উপচে উঠত আমার বাড়ির আলমারির মাথা। আজও এত বছর পর এমন কোনও পোস্টকার্ড হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাগজপত্রের ভাঁজ থেকে। কোথায় আছে তারা, কেমন আছে— ভেবে বুকের ভিতর টনটন করে ওঠে।

১৯৯১ সালে ‘সাক্ষরতা অভিযান’ আরম্ভ হয়েছিল। ২০০১-এর জনগণনায় সাক্ষরতার হার ১৫ শতাংশ মতো বেড়েছিল রাজ্যে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে উঠে এসেছিল তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবী ও নবসাক্ষররা। সুন্দরগড় অঞ্চলে গেলে আজও আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসে তারা। সরকারি স্তরে নৈতিক সমর্থনের অভাবে একাকিত্বের বোধ আমাকে ছাড়ত না। কিন্তু সঙ্গে যে অনেকেই ছিলেন, অনেক বেশি বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েও, তা আজ বুঝি।

অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি

নুন-মরিচ

সৌমিত্র বসু
soumitra2511@gmail.com

যখন বাদল ঘনায়

আকাদেমি-গিরিশ-মধুসূদন থেকে বেরিয়ে এসে যে কোনও পরিসরকেই অভিনয়ের জায়গা বানিয়ে ফেলার কাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের দলে নাম লেখানোর ভিতরে ভিতরে বাদল সরকারের ভূমিকা সাংঘাতিক।

নুন-মরিচের পাতায় একটা অপরাধ ঘটে গিয়েছে। গত ১৫ জুলাই এই কলম লেখা হয়েছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে, অথচ সেদিনটা ছিল বাদল সরকারের জন্মদিন। যদিও এই কলমটিকে কোনও দায় দেওয়া হয়নি জন্মদিন-মৃত্যুদিন পালন করার, তবু মনের মধ্যে খচখচ করছেই।

তখন ক্লাস এইট, তখন হাফ প্যান্ট। ঠাকুরমার কাছ থেকে একটা টাকা ম্যানেজ করে আকাদেমি-র দোতলার শেষ সারিতে বসে দেখলাম ‘বহুরূপী’-র নাটক— বাদল সরকারের লেখা ‘বাকি ইতিহাস’। সে নাটকে শেষের দিকে অন্ধকার একটা ধাতব কণ্ঠ বার বার নায়ককে জিগ্যেস করে, ‘তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?’ উত্তরে শরদিন্দু যা যুক্তি দেয়, অবহেলায় উড়িয়ে দেয় সে। নাটকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমাকে। এখনও মনে পড়ে, মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসেছি, জানলার বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার— তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন, আত্মহত্যা করোনি কেন... সে ট্রমা কাটতে বেশ সময় নিয়েছিল।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, ঠিক হল, বাদল সরকারকে বিভাগে আনা হবে, তিন নম্বর থিয়েটার নিয়ে কিছু বলবার জন্য। বাড়ি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসার কথা আমার। এদিকে আবার শঙ্খ ঘোষের ক্লাস। গোলি মারো, ক্লাস করে ঘণ্টাখানেক দেরিতে তাঁর বাড়ি পৌঁছেই তোপের মুখে! আমি আবার এমন ট্যালা, ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি কিছুই ধরিনি, ‘রাস্তায় বেরিয়ে কোনও একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ধরে নেব’ যেই বলেছি, সপাটে জবাব এল, ‘কলকাতায় কোনও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড নেই, যারা কলকাতায় থাকে তারা জানে।’ বাপ রে!

এফএম চ্যানেলের টক শো-তে একবার আনা হল তাঁকে। সঞ্চালিকা জিগ্যেস করলেন, ‘আচ্ছা, এই যে এতদিন ধরে আপনি অন্যরকম করে থিয়েটার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কী মনে হয়, সমাজ বদলেছে কিছু?’ বাদলবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, ‘দেখুন, মানুষ যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার মনে নানারকম স্মৃতি কাজ করে। আমার নাটক যদি কোনও সদর্থক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে অবচেতনেও কাজ করে, তার চেয়ে বেশি আর আমরা কীই বা করতে পারি?’ দারুণ জোর পেয়েছিলাম কথাটা শুনে। বহু যুগ পরে, মুখোমুখি বসে তাঁকে বলেওছিলাম সে কথা। আমাকে তছনছ করে দিয়ে উদাসীন গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এসব বলা ছাড়া নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার আর কী উপায় আছে বলুন?’

ওই যে বাদল সরকার বললেন, ‘অনেক টাকা দিয়ে হল ভাড়া করে, অনেক টাকা খরচ করে, উঁচু মাচায় উঠে যে-থিয়েটার— তা মানুষের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে’— এইটা মাথায় বসে গিয়েছিল। আকাদেমি-গিরিশ-মধুসূদন থেকে বেরিয়ে এসে যে কোনও পরিসরকেই অভিনয়ের জায়গা বানিয়ে ফেলার কাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের দলে নাম লেখানোর ভিতরে ভিতরে এই মানুষটির ভূমিকা সাংঘাতিক। তাই নিয়ে এইবার শেষ গল্প।

‘ইতিহাসের গপ্পো’ বলে একটা নাটক করি, যেটা তৈরি হয়েছে মাধ্যমিকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি টপিক নিয়ে, দেখানো হবে ক্লাসরুমের মধ্যে, পড়ানোর বিকল্প হিসাবেই। আমতার অনেকটা ভিতরের দিকে একটা মেয়েদের স্কুল, খুব গরিব ঘরের বাচ্চারা পড়ে সেখানে। কর্তৃপক্ষ আগেই বলে দিয়েছিল, তারা কোনও টাকা দিতে পারবে না, ফান্ড নেই— মেয়েদের বলে রাখবেন, তারা যদি কিছু দেয়। অভিনয় হল, মিড ডে মিলে খাওয়া হল ভাত-ডাল আর সোয়াবিনের তরকারি, নাট্যদলের সম্মানে একটা করে সেদ্ধ ডিম। তারপর একটা থলে এল হাতে। সাদা ছোট থলে, একটা ডালে দু’-তিনটে ফুল-পাতা—সেলাইয়ের কাঁচা কাজ, ডটপেনে আঁকাবাঁকা লেখা, সনজিদা খাতুন। আর ভিতরটা খুচরো পয়সায় ভর্তি। দু’-টাকা, এক টাকা, পাঁচ টাকার কয়েন। মোট দু’-হাজার উনিশ। সে যে কী ভারী, কী ভারী, বইতে চোখে জল এসে যায়!

নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার যে কথাটা আপনি বলেছিলেন বাদলবাবু, সেই দীর্ঘশ্বাসের মুখে ওই খুচরো পয়সাগুলো ঝনঝন করে ছুড়ে দিতে ইচ্ছা করে।

অভিনয় হল, মিড ডে মিলে খাওয়া হল ভাত-ডাল আর সোয়াবিনের তরকারি, নাট্যদলের সম্মানে একটা করে সেদ্ধ ডিম। তারপর একটা থলে এল হাতে। সাদা ছোট থলে, একটা ডালে দু’-তিনটে ফুল-পাতা—সেলাইয়ের কাঁচা কাজ, ডটপেনে আঁকাবাঁকা লেখা, সনজিদা খাতুন। আর ভিতরটা খুচরো পয়সায় ভর্তি। দু’-টাকা, এক টাকা, পাঁচ টাকার কয়েন। মোট দু’-হাজার উনিশ।

প্রথম পাতার পর

না। এই বিশ্বনাগরিকরা কারা? তাঁরা অধিকাংশই কিন্তু ভারতের বাইরে যাননি। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি সবই এই দেশে। কিন্তু মনজুড়ে ছিল সমগ্র বিশ্ব।

চিন্ময় ওই সময়টায় ১৯৬৮-র আন্দোলন ফ্রান্সে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এখানে তার অনুরণন হচ্ছে। পৃথিবী একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

কুণাল অকালপক্ক আমি গিলেছি এই বিশ্বনাগরিকত্ব। এই চেতনার জায়গাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জরুরি। কেন এই ‘কসমোপলিটানিসম’? এই জন্য যে, তার আশ্রয়ে আমার নিজস্ব জগতের কাহিনিও চেতনার স্তরে সর্বজনীন হয়ে উঠবে। কেবলমাত্র আমাদের দেশের নয়, হয়ে উঠবে বিশ্বের সাহিত্য। আইরিশ ‘গোরা’-কে বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কোনও বিদেশি চরিত্র নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় বিশ্বনাগরিক কে? রবীন্দ্রনাথ ও রমাঁ রলাঁ-র অসামান্য কথোপকথন— যার উপর আপনি লিখেছেন জাতীয়তাবাদ-আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্ম, বিপ্লব, শহুরে সংস্কৃতি বনাম গ্রামীণ সংস্কৃতি— ইত্যাদি দেশ-কাল ছাপিয়ে গিয়েছে। এই জায়গায় আমি পৌঁছতে চাইব না কেন? আরও সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, অরহান পামুকের লেখা ‘স্নো’ মৌলবাদের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা উপন্যাস। মৌলবাদ এক ভয়ংকর সমস্যা, শুধু একটি ধর্মের না, সমস্ত ধর্মের মৌলবাদ। এই উপন্যাসের সব চরিত্রই টার্কিশ। কিন্তু ‘স্নো’ পড়তে পড়তে মনে হবে এই লোকটিকে তো আমি চিনি! এই যে মৌলবাদী, সে তো হতেই পারে আমার ভাই বা পাড়ার বন্ধু। কখনও মনে হবে এ আমার নিকট আত্মীয়, আবার কখনও সভ্যতার শত্রু। আমি কলকাতায় বসে ইস্টার্ন টার্কির মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পাচ্ছি। এটাই তো বিশ্বনাগরিকত্ব। আমার লেখা, আমার চরিত্র, আমার চেতনা যদি কয়েকটি বর্গমাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আমি সাহিত্যিক হলাম কেন?

চিন্ময় সত্যি তো! সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি ‘আগন্তুক’-এ যখন মনমোহন চলে যাচ্ছেন বাড়ি থেকে, বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘কোন জিনিসটা কখনও হবে না কথা দিয়েছ?’ শিশুটি বলে, ‘কূপমণ্ডুক।’ মনমোহন উত্তর দেন, ‘কূপমণ্ডুক। মনে থাকবে?’ সত্যজিৎ রায়ের শেষ স্টেটমেন্ট, ‘কী, হবে না বলো?’ আপনি এক জায়গায় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, ‘বিশ্বনাগরিক’ হতে গেলে, কয়েকটি NRI-কে পাতার মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে দিলে হবে না। আট-নয়ের দশকের বাংলা উপন্যাসে এই ট্রেন্ড-টা ছিল। এখনও, কখনও কখনও দেখা যায় যে, গল্পকে বিদেশি মাত্রা দিতে বড়লোক NRI-কে গল্পে টেনে আনা হয়েছে। ‘তেজস্বিনী ও শবনম’ থেকে নতুনভাবে দেখা শুরু হল। এখানে মানুষ তার শিরা-ধমনী নিয়ে উপস্থিত। যখন তেজস্বিনী ও পাচার হয়ে যাওয়া সুন্দরবনের মেয়ের দেখা হচ্ছে, তখন বিদেশে মানুষ হওয়া বাদামি চামড়ার তেজস্বিনী বুঝতে পারছে যুদ্ধের রোজনামচা নয়, একে বাঁচানোই আমার সবথেকে বড় কাজ। তখন সুন্দরবনের ঢেউ আরবের মরুভূমিতে প্রবাহিত হয়ে, জীবনের চওড়া মোহনায় ছড়িয়ে পড়ছে... আপনি তো ছোটবেলায় বাম রাজনীতি করতেন, তাই না?

বড় শত্রু কমিউনিস্ট পার্টি

কুণাল আমরা সকলেই করতাম সেই সময়ে।

চিন্ময় সাতের দশক ধরা যাক। তখন আপনার ক্রিয়েটিভ কার্যকলাপ কীরকম ছিল?

কুণাল কলেজের সব লেখালিখিই বাংলায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। বেশির ভাগ খুব খারাপ। আমরা সকলেই করেছি। যাকে বলে— রাইট অফ প্যাসেজ। ভীষণ শক্ত শক্ত তৎসম শব্দ জাহির করে বেশ খটমট লেখা। একটা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে, ‘প্রতিভার নির্মোক ও আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসন’। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী বলে তখন তাঁকে একদম ভাল লাগত না, পরবর্তীকালে বেশ ভাল লাগতে শুরু করে।

প্রথমদিকের লেখা সবই বাংলায়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি-র সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছি। ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এ বইয়ের সমালোচনা। উৎপলদা-র সঙ্গে নাটক। সাহিত্যের ঘরে জন্মেও সাহিত্যের কাছে ফিরে আসার জন্য যে-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, সেটা হল আটের দশকে আমেরিকা থেকে মাস্টার্স করে ফিরে আসার পর। এটাই আমার সাহিত্যজীবনের সবচেয়ে জরুরি অভিজ্ঞতা। ফিরে এসে দেখলাম এই শহরে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। বামপন্থীরা ব্যারিকেড ছেড়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আত্মগোপন করে আছে। শহরের আনাচকানাচে, অলিতে-গলিতে বামপন্থী, কিন্তু বামপন্থার টিকি নেই। দেখলাম সরকারি অনুদান পাবে বলে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে নাট্যশিল্পী, সাহিত্যিক, ফিল্মমেকার, কবি।

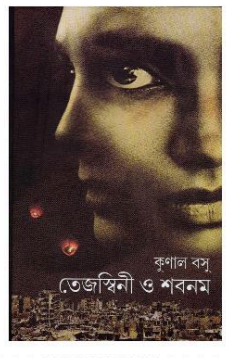

এই বামপন্থাকে আমি চিনতে পারলাম না। এর জন্য তো আমার মা-বাবা, তাদের বন্ধুবান্ধব জেল খাটেননি। কলকাতার রাস্তায় পরিচিত কমরেডদের সঙ্গে দেখা হলে, তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। ব্যাপারটা কষ্টকর ছিল অবশ্যই, কিন্তু এই কষ্ট, এই প্রত্যাখ্যান প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যাখ্যান আমার সামনে একটা নতুন দিক তুলে ধরল। আমি আমার বইয়ের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলাম। Rejection defines my personality. প্রত্যাখ্যাত হব বলে আমি বসে আছি। ওই আটের দশক থেকেই।

চিন্ময় পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, সমাজের কঙ্কালটার মধ্যে কী কী পরিবর্তন হল তার বিশ্লেষণ দেখেছি। এখানে কিন্তু দেখিনি। বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর যে-পরিবর্তন হল, সেটা অনিবার্য ছিল হয়তো, কিন্তু তাতে তার কামড়টা চলে গেল। একদিক থেকে একটা পার্মানেন্ট ক্ষতি হল। এর একটা সমাজৈতিহাসিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। হয়নি। আমাদের সমাজতাত্ত্বিকরা দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন।

কুণাল কার্ল মার্কস-এর একটা কথা মনে হত, ছোটবেলায় খাবার টেবিলে বাবার কাছে শোনা। মার্কস বলেছিলেন, ‘বি স্কেপটিক, সন্দেহ করো, প্রশ্ন করো।’ মার্কসের সমাধি দেখতে গিয়ে লন্ডনে আমার এটাই মনে হয়েছিল— একটা সন্দেহবাতিক লোক মাটির তলায় শুয়ে আছে। কিন্তু ভোটে যাঁরা জেতেন তাঁরা প্রশ্ন করা পছন্দ করে না। ফিরে এসে দেখলাম যে-শহরে আমি বড় হয়েছি সেখানে প্রশ্নকর্তারা ছুটি নিয়েছেন।

চিন্ময় ’৭৭ সালের ইলেকশনে আপনি অংশ নিয়েছিলেন। ‘জরুরি অবস্থা’-র সময় রাজনীতি করেছিলেন ঝুঁকি নিয়ে।

কুণাল হ্যাঁ। যে-কারণে আমার পাসপোর্ট আটকে দেওয়া হয়েছিল। যাক, সে-প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আটের দশকের শুরু থেকেই বামপন্থার সত্যিকারের পথদ্রষ্টারা সরে যাচ্ছিলেন, জাঁকিয়ে বসছিলেন কর্মকর্তারা। পাস্তারনাকের ‘ডক্টর জিভাগো’ মনে পড়ে যাচ্ছিল। সার্ত্র বলেছিলেন, বিপ্লবের সবথেকে বড় শত্রু হল কমিউনিস্ট পার্টি।

(পরের সংখ্যায়)

অনুলিখন অগ্নিভ মাইতি

বিশেষ কৃতজ্ঞতা গোর্কি সদন, দে’জ পাবলিশিং